জম্মু-কাশ্মীরে সরকার গঠনের সলতে পাকানো শুরু

জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় কয়েক সপ্তাহ আগে মেহবুবা সরকারের ওপর থেকে বিজেপি সমর্থন প্রত্যাহার করার পরই। কিন্তু রাজ্য বিধানসভাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এবার সেই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ওই রাজ্যে ফের সরকার গঠনের সলতে পাকাতে শুরু করেছে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল। বিজেপিও চুপ করে বসে নেই। আর একবার ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন পিডিপি নেত্রী এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। গত কয়েকদিন যাবৎ তিনি রাজধানীতেই রয়েছেন। শলা-পরামর্শও চলেছে কাশ্মীর নিয়ে। কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। আর সোমবার এই জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ অবশ্য পিডিপি'র সঙ্গে জোটের কথা উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, এমন সম্ভাবনা বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও নেই। তবে তিনি একথা বললেও রাজনীতিতে সবই সম্ভব। অতীতে এমন ঘটনার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, পিডিপি'র সঙ্গে সমঝোতা করে কাশ্মীরে সরকার গঠন করলে কংগ্রেস আদৌ লাভবান হবে কিনা। কারণ বিজেপি চুপ করে বসে থাকবে না। তারা অশান্তির দায় চাপাবে কংগ্রেসের ওপর। সুতরাং পরিণত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কংগ্রেসকে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি।

দেহের মধ্যে সুজন যে জন তার ঘরেতে ঘর ঘর করেছি,

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে তাই বসে আছি।

কালীনাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,

রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি।

ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া আবার গাহিতেছেন-

আমি দেহ বেচে ভাবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।

(গিরিশাদি ভক্তের প্রতি)-''ভাবেতে ভরল তনু হরল গেঞ্জান।

সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এ সব চাই।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার-পরমহংস অবস্থা)

''**ভক্তিই সার।** সকাম ভক্তিও আছে; আবার নিষ্কাম ভক্তি, শ্রদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি এও আছে। **কেশব সেন ওরা** অহেতুকী ভক্তি জানত না; কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি।''

''আবার আছে,**উর্জিতা ভক্তি।** ভক্তি যেন উথ্‌লে পড়ছে। 'ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।' যেমন চৈতন্যদেবের। রাম বললেন লক্ষণকে, ভাই যেখানে দেখবে উর্জিতা ভক্তি, সেখানেই জানবে আমি স্বয়ং বর্তমান।''

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন, নিজের অবস্থা? ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার? জীবকে ভক্তি শিখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ–আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ---ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভালো হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হল , না আপনি ভাল হল, কে বলবে?

''লক্ষণ বলকুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লবকুশ বললে, ঠাকুর সব জানি, সব শুনেছি। পাষাণী যে মানব হল সে মুণিবাক্য ছিল। গৌতমমুনি বলেছিলেন, যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন; তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুণিবাক্যে, কে বলবে বল।''

''**সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে।** এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয়, আমাকে জানবে হেতুমাত্র।

দিনপঞ্জিকা

১৮ আষাঢ়, ভাঃ ১২ আষাঢ়, **৩ জুলাই,** ১৮ আহার, সংবৎ ৫ আষাঢ় বদি, ১৮ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **মঙ্গলবার,** পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৫ মিঃ। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৭ মিঃ। প্রীতিযোগ প্রাতঃ ঘ ৫।৮ মিঃ। কৌলবকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।৫২ গতে তৈতিলকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৫ গতে গরকরণ। **জন্মে**–– কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর, রাত্রি ঘ ১২।১৭ নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ১২।১৭ গতে ত্রিপাদযোষ।। **যোগিনী**–দক্ষিণে, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৫ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৪০ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৪৩ গতে ৯।২ মধ্যে। **যাত্রা**–– মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ঘ ৩।২ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৫ গতে যাত্রা শুভ মাত্রা উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১২।১৭ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**–নাই। **বিবিধ**– পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমৃতযোগ**–– দিবা ঘ ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**––দিবা ঘ ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৮ আষাঢ়, ভাঃ ১২ আষাঢ়, ৩ জুলাই, ১৮ শওয়াল, ১৮ আহাব, উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২২, মঙ্গলবার, পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৪, সেহ্‌রী শেষ ৩।২৩ ইফ্‌তার ৬।৩০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ব্রাহ্মণত্বে হানি ও পুনরুজ্জীবন

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

''অনভ্যাসে বেদনামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুবিপ্রাঞ্জি ঘাংসতি।।''
–মনুসংহিতা ৫/৪

বেদসমূহের অনভ্যাস, তজ্জনিত সদাচারের পরিবর্জ্জণ এবং সৎকার্যে আলস্য ও অন্নদোষ ব্রাহ্মনগণকে ধংস হনন করিতে চাহিতেছে।

ব্রাহ্মন তথা পুরোহিত হলেন সমাজের আদর্শ ও গুরুস্থানীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''ভারতের ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ''। সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা শুধু নয়, আদর্শ, নীতি, নিয়ম, শাস্ত্র নির্দেশ ইত্যাদি তাঁদের দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। পূজার্চ্চানা, যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা ইত্যাদিও তাঁদেরই কর্ম। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভাব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রাহ্মণকে অনেক নিয়ম মেনে চলতে হতো, যেমন-উপযুক্ত সময়ে দশসংস্কারাদি করতে হতো, উপনয়ণ ও গুরুকরণ করতে হতো, বেদ অধ্যয়ণ, তপস্যা, ব্রহ্মভাবনা, সর্বময় সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বভূতে দয়া, ক্ষমা, দান, পরোপকার তথা গুণ ও কর্মনুসারে তাঁরা ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত হতেন। কিন্তু কালপ্রভাবে ব্রাহ্মনের সেই ঐশীগুণাবলী আজ অন্তর্হিত। তাই কিছু কারণে এবং অকারণেও ব্রাহ্মণ আজ বহু অভিযোগের শিকার। ব্রাহ্মণ আজ পথভ্রষ্ট। ধর্ম ও সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

বর্তমান কলিযুগে এরূপই দেখা যাচ্ছে। আজ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে হানি হয়েছে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েও অনেকের উপনয়ণ হয় না। উপনয়ণ হলেও উপবীত পরিত্যাগ করেন, ত্রিসন্ধ্যা- আহ্নিক-উপাসনাদি করেন না, ধর্মশাস্ত্র, ঠাকুর-দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করেন, অখাদ্য-কুখাদ্য ও শূদ্রান্ন ভক্ষন করেন এবং যাঁদের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা নাই, ম্লেচ্ছ ও পানাসক্ত, তাঁরা পতিত বলে গণ্য হন। ব্রাহ্মনত্ব নষ্টকরার জন্য অনেকে সচেষ্ট থাকেন, অন্যদিকে শূদ্রগণও সৎকর্ম করে ব্রাহ্মনত্ব লাভ করতে পারেন। এসব ধর্মের দিক থেকে ভীতিপ্রদর্শন বা স্তোকবাক্য নয়, এসব শাস্ত্রের কথা।

জন্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হলেও অনেকেই কুলধর্ম পালন করেন না। ধর্মকর্মানুষ্ঠানে তাঁদের অজ্ঞানতার কারণে প্রভাব কমে গেছে। খজন-খাজন, পূজা-অর্চ্চনা আজ যাঁরা করছেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ দেখা যাচ্ছে। অনেকে আবার ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করে ভিন্ন বৃত্তি বা চাকরি অবলম্বন করছেন। অনেকেই জুতোরদোকান, লন্ড্রী, ট্যাক্সি চালনায় মনোনিবেশ করেছেন। আবার কিছু কিছু মানুষের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দা, ধর্মের প্রতি ভ্রু-কুঞ্চানাদির জন্য ব্রাহ্মণ সন্তানগণ আর এই বৃত্তিতে আসতে চাইছেন না। যদি ব্রাহ্মণ সন্তানগণ উপরোক্তভাবে নিজেদের তৈরি না করেন, অথচ ব্রাহ্মণতর কর্ম করতে থাকেন, তাহলে তাঁদের পতন অনিবার্য। তপস্যাহীন, পবিত্রাহীন, ব্রহ্মচর্যহীন, জ্ঞান বিজ্ঞানহীন, নাস্তিক ব্রাহ্মণগণ হলেন সমাজের শত্রু ও নিজের শত্রু।

প্রাচীন ঋষিগণও অনুমান করেছিনেল ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণত্ব মৃত্যু (ধ্বংস) গ্রস্থ। একালের ব্রাহ্মণ সম্পর্কে 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তে'' প্রকৃতিখন্ডে ২১ অধ্যায় হইতে বঙ্গানুবাদ মানবতত্ব পৃঃ ২২২ তে বলা হয়েছে- ''বিষুণ্ডমত্রহীন'' ত্রিসন্ধ্যারতি, একাদশীবিহীন, হরিরণৈবেদ্যভোজী, ধাবক কৃষভাহক, শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহি, সূত্রের পাচক, শূদ্রযাজী অসিজীবী, মসিজীবী, কল্যাণবিক্রয়ী, হরিনামবিক্রয়ী, বিদ্যাবিক্রয়ী, দিবসেদ্বিভোজী, মৎস্যভোজী, শালগ্রাম পূজাদিরহিত ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের ন্যায় নামেমাত্র ব্রাহ্মণ।'' এই দোষসমূহ বর্জন করলে ব্রাহ্মণ সমাজে আবার সমাদরনীয়রূপে পরিগণিত হয়ে নিজেরও সমাজের কল্যাণ পরম্পরার সমুদ্ঘাটন করতে সমর্থ হবেন। নতুবা নয়।

মানবকল্যাণে ব্রাহ্মণকে তাঁর হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে যে সমস্ত গুণাবলীর কারণে ব্রাহ্মণ অতীতকালে প্রতিষ্ঠিত ও আদৃত ছিলেন, আজ তার পুরনরুজ্জীবন প্রয়োজন। সমাজে এখনও যে সব প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রয়েছেন, তাঁরা যেন উদ্যোগী হয়ে ব্রাহ্মণ সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য সচেষ্ট হন এবং ভবিষ্যৎ সমাজকে রক্ষা করেন। এই সঙ্গে ধর্মকেও রক্ষা করেন। এটিই সমাজের মঙ্গলের জন্য অনিবার্য। আসলে পুজো হল ভগবানের কাছে আত্মসমর্পন। পুজো করার মধ্যে একটি অন্তনির্হিত মূল্য আছে। সাময়িকভাবে পুরোহিতের মনটি ঈশ্বরমুখী হয়। এভাবে তাঁদের মন গুরুলাভের সুযোগ পায় এবং জাগতিক সমস্যাসঙ্কুল ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। আশার কথা, সম্প্রতি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট' নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে পুরোহিতদের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত।

ভগবান তথাগত বুদ্ধের আজীবন অনুরাগী প্রেমিকপুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

গদাধর রানা
শেষ পর্ব

রবি ঠাকুর বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবসন্তান বলেই মান্যতা দিয়েছেন। কবির মৃত্যুর ছয় বছর আগে বাংলা ১৩৪২ সনে অনুষ্ঠিত কলকাতার ধর্মরাজিকা চৈতন্যবিহারে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবের এক ভাষণে বুদ্ধদেবের প্রতি গাঢ় অনুরাগে তাঁকে তিনি প্রণাম নিবেদন করেছিলেন--সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রবিঠাকুর বলেছিলেন–এ কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়। একান্ত নিভৃতে অভ্যাসনুসারে শ্রদ্ধার্পন করার মতোই আমার এই অর্ঘ্য।

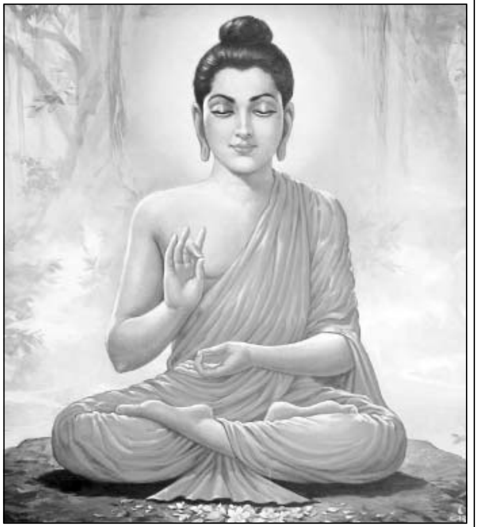

এক্ষণে, আমরা বুদ্ধদেবের প্রতি বরীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ কেমন করে তাঁর সৃষ্টিকর্মেতে অনুরনিত হয়েছিল। কেমন করে বর্তমান পৃথিবীর হিংসা, লোভ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিনে শান্তিকামী মানুষের ক্রন্দনধ্বনির অনুরণন ঘটেছিল তাঁর কবিতায়, তা লক্ষ্য করতে পারি। তাঁর কাব্যে তিনি বলেছেন – হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব / ঘোর কুটিল পন্থ তা লোভ জটিল বন্ধ। /নূতন তর জন্মলাগি কাতর যত প্রাণী /কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী/বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ। / শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য করুণাঘন / ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

রবীন্দ্রনাথের বুঝি বিশ্বাস ছিল--মহান্‌ তথাগতের দক্ষিণ হস্তের কল্যাণস্পর্শে ধরণীর সকল গ্লানি /কালিমা দূরীভূত হয়ে পৃথিবী আবার শুচিশুভ্র হয়ে উঠবে। আরও এক বুদ্ধপূর্ণিমায় দুর্গতি বিনাশকারী বুদ্ধদেবকে কবিবর স্মরণ করে স্বীয় কাব্যে তুলে ধরলেন –

সকল কলুষ তামস হর / জয় হোক্ তব জয় / অমৃত বারি সিঞ্চন করি নিখিল ভুবনময়।

বুদ্ধদেব একদিকে করুণার সার্থক প্রতীক আবার অন্যদিকে সমস্ত অন্যায় অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য অমৃতধারা সিঞ্চনেও প্রয়াসী।

বুদ্ধের সতত শান্ত করুণাঘন মূর্তিকে শ্রদ্ধানুরাগে কবিবর তাঁর কাব্যে বললেন --বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে / নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি / দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে ঘূরিছে অধর পরে / করুণার সুধা হাস্য জ্যোতি।

বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়েই রাজসিংহাসন থেকে নেমে এসে সমূহ সংসারে ও জাগতিক সুখভোগ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কাছে সমূহ জাগতিক প্রাপ্তি ছিল তুচ্ছ। রবীন্দ্রসাহিত্যেও পরতে পরতে আমরা রবিকবির ত্যাগের আদর্শকে দেখেছি। উপনিষদের অমৃতবাণী 'তেন ত্যক্তোন ভুঞ্জীথা'' বাণী ছিল রবীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র। সেকারণেই কবিকন্ঠে ধ্বনিত হতে শুনি –

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয়নাই ওরে ভয়নাই, /নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয়নাই তার ক্ষয় নাই।

ত্যাগের প্রতিমূর্তি বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে কবি লিখেছেন– ''এসো দানবীর, দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা / মহাভিক্ষু লও, সবার অহংকার ভিক্ষা।''--এ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। রবিকবি প্রকৃতই বুদ্ধের উত্তরসাধক–ভারততীর্থ সঙ্গমে কবি গাইলেন–

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাহুংকার ধ্বনি। / হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।/ তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া / বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।।

ভারতীয় ঐক্যত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশও ঘটেছিল বুদ্ধদেবের বাণীর মধ্য দিয়ে। ''আত্মার অমৃত অন্ন'' দান করে বুদ্ধদেব দূরবাণী অনাত্মীয়দেরও এক নিবিড় ঐক্যের বন্ধনে বেঁধেছিলেন। এই ঐক্যবন্ধনের মূলে ছিল না তাঁর রাজ্যজয়ের বাসনা, শুধু ছিল কল্যাণের প্রেরণা, সেই প্রেরণারই উৎস ছিলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং।

বুদ্ধদেব জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানুষের অভিজাত্য দান করেছে। বুদ্ধদেব জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে কর্মগত শ্রেষ্ঠত্বকেই উচ্চে স্থান দিয়েছেন। যা মানবতার পূজারি রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল একথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাই কবিবর দ্বিধাহীনচিত্তে বলেছেন –

''এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার–

এসো হে পতিত অপনীত সব অপমান ভার।''

–বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ যেন এক চিরকালীন নির্ভরতা রবিকবির জীবনে দুঃখ, অশান্তি বা অমঙ্গল যখনই দেখা দিয়েছে তখনই তিনি স্মরণ করেছেন মহামানব ভগবান তথাগত বুদ্ধকে। স্বদেশের দুঃখেও যেমন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শরণ নিয়েছেন, তেমনই জগতের দুর্দিনেও কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমেই মহামানব বুদ্ধকেই স্মরণ বারেবার ঃ-

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ্য মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আমাদের জাতীয়চিত্তে মহামানব বুদ্ধকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সীমাহীন।

সম্পাদক সমীপেষু

সুরের সাথে মহিলারাও এসেছিলেন

সুরের কথা বললেই বড়সড় সুরকারদের কথাই বলা হয়, ভারতীয় সংগীতে মহিলারাও নিজেদের তুলে ধরেছিলেন। যখন কথা বলতে শিখেছে সিনেমা তখনই গানগুলিতে সুরের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন মহিলারা। এটা হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। তখন সিনেমা সবেমাত্র মানুষকে একটা আনন্দ দিচ্ছে। এই অবস্থাতে মহিলারাও এগিয়ে এসেছিলেন গানের সুর সংযোজন করবে বলে। ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা সুরকার হিসাবে যিনি সিনেমাতে সুরের লহড়ায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা তাঁর কথা জানতেই পারিনি। তিনি হলেন ইসরাত সুলতানা। তিনি আদি-ই জাহাঙ্গীর ছবিতে সুরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর যে মহিলা সুরকার সুরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি হলেন জর্দন বাঈহুঁ সেন। এই মহিলা সঙ্গীত পরিচালিকার আরও একটা পরিচয় আছে। ইনি হলেন অভিনেত্রী নার্গিস দত্তের মা। ১৯৩৫ সালে তালাসে হক ছবিতে প্রথমবার সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন তিনি। এছাড়া হৃদয়মন্থন, ম্যাডাম, ফ্যাশন, জীবন স্বপ্না, মতিকা হার ছবিতেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করে গেছেন ।এবছর তিনি ১২৭ বছরে পা রাখলেন। ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সরস্বতী দেবী তাঁর আসল নাম খুরশিদ মিনোচর হোম। পার্সি মহিলা ছিলেন। হিমাংশু রায় সরস্বতীদেবী নাম দিয়েই ভারতীয় সিনেমায় এনেছিলেন। ইনি ১৯৩৫ সালে জবানী কী হাওয়া ছবিতে প্রথমবার এসেছিলেন। ১৯৩৪ সালে প্রথমবার ইসরাত সুলতানা ছবিতে সুর করেছিলেন প্রথমেই বলেছি। এরপর দেখা গেছে, লতা সাত্তার সুরের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিশোর কুমারও মমতাজ অভিনীত প্যার দীবানা ছবিতে সুর করেছিলেন। শারদা একজন ভাল গায়িকা ছিলেন। তিনি মা-বহেন-বিবি ছবিতে সুরকারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উষা খান্নার কথা আমরা প্রত্যেকেই জানি। হিন্দি ও বাংলা ছবিতে সুর করে গেছেন তিনি। বাপি লাহিড়ী মা বাঁশরী লাহিড়ী দিল্লি থেকে কলকতা ছবিতে সুর করেছিলেন। উৎপলা সেনের সুরে বনশ্রী সেনগুপ্ত গেয়েছিলেন ''দূরে গেলে যেন ভুলে যেওনা। লতা মঙ্গেশকরের সুরে কিশোর কুমার গেয়েছিলেন, 'আমি নেই ভাবতেই ব্যাথায় ব্যাথায় মন ভরে যায়।' অসীমা মুখোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) তিনিও চৌরঙ্গী ছবিতে সুরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আর মান্না দে গেয়ে ছিলেন তাঁরই সুরে–'বড় একা লাগে'। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন, 'তন্দ্রা হারা রাত ঐ জেগে রয়।' নীতা সেনেও বহু বাংলা ছবিতে সুরের মালা গেঁথে গেছেন। যেমন বাবা তারকনাথ, কৃষ্ণসাদামা, রক্তজবা ছাড়াও আরও কিছু বাংলা সিনেমায় তাঁর সুরের পরিচয় আমরা পেয়েছি।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়